Kultali Dr. B. R. Ambedkar College
Department of Philosophy
1st Semester'/PHIA/CC-1

বিভিন্ন ভারতীয় নাস্তিক দর্শন-সম্পদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে যে দুটি পঙক্তিতে তালিকাভুক্ত করা হয় তা হল- (ক) নাস্তিক দর্শন-সম্প্রদায় ও (খ) আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়।

নাস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়ের অগ্রভাগেই আছে চার্বাক-দর্শন; বিভিন্ন দার্শনিক-সাহিত্যে চার্বাককে নাস্তিক-শিরোমণি হিসেবেও আখ্যায়িত করতে দেখা যায়। চার্বাক ছাড়া বাকি দুটি নাস্তিক সম্প্রদায় হলো- জৈন-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন।

অন্যদিকে প্রচলিত মতে বেদবিহিত অর্থাৎ বৈদিক-সংস্কৃতির অনুসারী আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দর্শন ছয়টি বলে এগুলি একসাথে ষড়্দর্শন নামেও বহুল পরিচিত। এই ষড়্দর্শনের অন্তর্ভুক্ত দর্শনগুলি হলো- ন্যায়-দর্শন, বৈশেষিক-দর্শন, সাংখ্য-দর্শন, যোগ-দর্শন, পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

এই প্রবন্ধে আমরা নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব

যেহেতু আমাদের লক্ষ্যই হলো চার্বাকের খোঁজ করা, তাই বর্তমান গ্রন্থে আমাদের এখনকার ও পরবর্তী যাবতীয় উদ্যোগের মূল কেন্দ্রই হচ্ছে চার্বাক-মতের একটা যৌক্তিক রূপরেখা প্রণয়ন-প্রত্যাশা। সেক্ষেত্রে চার্বাক-দর্শনের আগাম পরিচয় উপস্থাপন অতি-স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ইতিহাস ঐতিহ্য দৃষ্টান্ত সহ সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। তবু আমরা প্রচলিত চিন্তাধারায় চার্বাক-দর্শনের প্রাথমিক পরিচয়সহ বাকি সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জেনে নিতে পারি।

চার্বাক-দর্শন:

চার্বাকের মূল তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত-সার আগেই বলা হয়েছে। তবু আরেকটু যদি বলতে হয়, চার্বাককেই নামান্তরে লোকায়ত বা বার্হস্পত্য দর্শন বলে উল্লেখ করার নজির আছে। বার্হস্পত্য মানে বৃহস্পতি-প্রতিষ্ঠিত দর্শন। বৌদ্ধশাস্ত্র, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতির নজির থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, সম্প্রদায়টির ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন রচনা আবিষ্কৃত হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই বলে মনে হয়। অথচ এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এককালে এ-জাতীয় রচনা সত্যিই প্রচলিত ছিলো। আর তাই সন্দেহ প্রযুক্ত হয় যে হয়তো বা বিপক্ষ-মতাবলম্বীরা স্বেচ্ছায় তা ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু এ-সন্দেহ প্রমাণসাপেক্ষ হোক আর নাই হোক, মোটের উপর আজকের দিনে অন্যান্য বিপক্ষ-সম্প্রদায়ের রচনা সম্ভার থেকেই এই সম্প্রদায়টির পরিচয় সংগ্রহ করতে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা চার্বাক বা লোকায়ত-মতের খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে-সব উক্তি করেছেন

তা থেকেই ওই সুপ্রাচীন সম্প্রদায়টির প্রকৃতরূপ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা নিতে হয়। স্বভাবতই এ-প্রচেষ্টা সমস্যা-কণ্টকিত। কেননা প্রথমত, এ-জাতীয় বিপক্ষ-উক্তিগুলি খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত- বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাক বা লোকায়ত মতের যে উল্লেখ রয়েছে, এ-জাতীয় উল্লেখের মধ্যে সব সময় খুব সুস্পষ্ট সঙ্গতিও নেই। দ্বিতীয়ত, এই উল্লেখগুলি অত্যন্ত প্রকটভাবেই বিরুদ্ধ ও বিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক যে, অনেক সময় এমনকি ওই প্রাচীন সম্প্রদায়টিকে নেহাতই উপহাস-পরিহাসের বিষয় বলে প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাই হয়েছে। তাই বিপক্ষ-সম্প্রদায়ের এ-জাতীয় বিরুদ্ধ-সাক্ষ্যগুলির উপর নির্বিচারে নির্ভর করা যায় না। তৃতীয়ত, প্রাচীনতর নিদর্শনগুলির মধ্যে আলোচ্য সম্প্রদায়টি সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ তাও অনেকাংশে পৌরাণিক কল্পনায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়; তা থেকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা খুবই সযত্ন-প্রচেষ্টা-সাপেক্ষ।

এ-জাতীয় নানা সমস্যা সত্ত্বেও এটুকু অন্তত নিঃসন্দেহে বলা যায়, চার্বাক বা লোকায়ত বলতে প্রাচীনকালের কোনো এক বস্তুবাদী বা জড়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায় বোঝাতো। আধুনিক যুগের বস্তুবাদের সঙ্গে ওই প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের সুপ্রাচীন বস্তুবাদের অভিন্নত্ব প্রত্যাশা করা যায় না অবশ্যই। তবু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আত্মা নামক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা অস্বীকার করে জড়দেহকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করেছিলেন এবং তাঁদের মতে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র। তাঁরা এও দাবি করেছেন, বেদ বা শ্রুতির কোনো প্রামাণ্য নেই, এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ শুধু অর্থহীনই নয়- প্রবঞ্চনামূলকও। তাছাড়া এটাও ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই চার্বাকেরাই যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন, যদিও এ-বিষয়ে তাঁদের প্রকৃত বক্তব্যের প্রায়ই এক বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নীতিবোধ সম্বন্ধেও বহু কুৎসা প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্বাক বা লোকায়তিকদের কোনো এক সুস্থ নীতিবোধের ইঙ্গিত উদ্ধার করা অসম্ভব নয় বলে আধুনিককালের বিদ্বান গবেষকেরা মনে করেন।

জৈন-দর্শন:

ভারতের প্রাচীনতম অসনাতন নাস্তিক্য ধর্মদর্শনের অন্যতম হচ্ছে জৈনদর্শন। 'জিন' শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। 'জিন' অর্থ বিজয়ী। যিনি ষড়রিপুকে জয় করেছেন, তিনিই জিন। জৈনদের মতে, যথার্থ সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে যাঁরা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেছেন তাঁরাই জিন। জৈন ঐতিহ্যে এজাতীয় চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের পারম্পর্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, যাঁদেরকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই পরম্পরায় চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। মহাবীর ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। তাই জৈন ঐতিহ্যের ওই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে জৈনধর্মকে অত্যন্ত প্রাচীন বলে স্বীকার করতে হবে।

জৈনরা বেদও মানেন না, ঈশ্বরও নয়। প্রত্যেক জীবই জিনদের পন্থা অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস। দার্শনিক দৃষ্টিতে জৈনদের নিজেদের মধ্যে কোন ভেদ না থাকলেও পরবর্তীকালে জৈনধর্ম দু' টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় আচারগত দৃষ্টিতে কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায়। জৈনমতের এই দু' টি অবান্তর ভেদ হচ্ছে- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের যতি বা সন্ন্যাসীরা নিজ শরীরের আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রের উপযোগ গ্রহণ করেন না, তাঁরা সর্বদা নগ্ন থাকেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যতিরা সাদা বস্ত্র পরিধান করেন। আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ভিন্নতা ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মূল ধর্মসূত্র অভিন্ন।

জৈনদর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে জানি তাই সত্য ও যথার্থ। জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, অতএব কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুসমূহ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, জীব এবং অজীব। দেহ যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা তথা সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈনধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি। জৈনরা বেদ ও উপনিষদে বিবৃত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। যেমন তাঁরা পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাস করতেন এবং মেনে নিয়েছিলেন যে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা কিংবা দৈত্যের দেহ ধারণ করতে পারে। এই মতে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে উর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে, পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে দেবতারও মানুষের ঘরে পুনর্জন্ম লাভ করা দরকার। তবে সবকিছু ছাপিয়ে জৈনরা অহিংসাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ভেদে তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়। প্রত্যক্ষ হচ্ছে সকলের স্বীকৃত প্রমাণ। লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে জৈনরা অনুমানকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন এবং তীর্থঙ্করদের উপদেশবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে মনে করেন। শব্দের অন্য নাম হচ্ছে আগম।

দার্শনিক তত্ত্ব এবং এমনকি যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও জৈনদের অহিংসা-নীতির প্রভাব চোখে পড়ে। কেননা দার্শনিক তত্ত্ব বিচারেও জৈনরা বিপক্ষ-মতের প্রতি এক অদ্ভূত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের দর্শনের একটি মূল কথা হলো অনেকান্তবাদ। এই অনেকান্তবাদের ব্যাখ্যাটা এরকম,- সত্তা বহুমুখী, অতএব বিবিধভাবে তা বর্ণিত হতে পারে- তার মধ্যে কোনো বর্ণনাই মিথ্যা নয়, আবার কোনো বর্ণনাই একমাত্র সত্য নয়। তাঁদের তর্কবিদ্যার একটি মূলকথা হলো স্যাৎবাদ। এই স্যাৎবাদ কী? এই মতে, সত্তার বহুমুখী দিক সম্বন্ধে সামগ্রিক উক্তি একমাত্র পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। আমরা পূর্ণজ্ঞানী নই; অতএব প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের প্রতিটি উক্তিই শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনামূলক। এই সম্ভাবনার নির্দেশক শব্দ হলো স্যাৎ। স্যাৎ মানে কোনোভাবে সম্ভব। অতএব প্রত্যেক উক্তির সঙ্গে স্যাৎ শব্দ যোগ করা প্রয়োজন। তাছাড়াও, সমস্তরকম বিকল্প-সম্ভাবনার কথা মনে রাখাও প্রয়োজন। অতএব কোনো বিষয়ে শুধু অস্তি (=আছে) বা নাস্তি (=নাই) বলা ঠিক নয়। তার বদলে একই বিষয়ে বলতে হবে- স্যাৎ অস্তি (সম্ভবত আছে), স্যাৎ নাস্তি (সম্ভবত নাই), স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (সম্ভবত আছেও নেইও), স্যাৎ অব্যক্তম্ (সম্ভবত অবক্তব্য), স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছেও অবক্তব্যও), স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত নেইও অবক্তব্যও), স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছেও, নেইও, অবক্তব্যও)। স্যাৎ-বাদ বুঝাতে জৈনাচার্যগণ এই যে সাতটি পরামর্শ বা বাক্যের প্রয়োগ করেন, প্রত্যেক বাক্যকে এক একটি ‘ভঙ্গি’ নামে ডাকা হয় এবং সাত প্রকার বাক্যকে একত্রে সপ্তভঙ্গি বলা হয়। এর পূর্ণনাম ‘সপ্তভঙ্গিনয়’।

বলা বাহুল্য, অহিংসা নীতির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হলেও ভারতীয় দর্শনে এ জাতীয় তর্কবিদ্যার চিত্তাকর্ষক বিকাশ ঘটেছিলো। কোন কোন গবেষক অনুমান করেছেন, জৈনদের এই স্যাৎ-বাদের মধ্যেই আধুনিক স্ট্যাটিসটিকস বিজ্ঞানের মূলসূত্রের আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-দর্শন:

ভারতীয় দর্শনের যে সকল সম্প্রদায় বেদভিত্তিক উপনিষদীয় চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছেন, বৌদ্ধরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী সম্প্রদায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যখন উপনিষদীয় চিন্তাধারা কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসার বিরোধে ধর্মসংকটের ন্যায় তত্ত্বসংকটের সম্মুখীন হয় তখন শাক্যবংশীয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের কঠোর তপস্যালব্ধ সত্যের অনুসারী এক বেদবিরোধী সম্পদায় দর্শনের আঙিনায় আবির্ভূত হন। এই সম্প্রদায়ই 'বৌদ্ধ সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। বুদ্ধ উপনিষদীয় কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের চুলচেরা যুক্তিতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে এবং জড়বাদ ও নাস্তিকতার দার্শনিক সমস্যায় মগ্ন না থেকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য এক আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বেদভিত্তিক না হয়েও সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির সহায়ক হয়েছিলো। ধীরে ধীরে এই চিন্তাধারার প্রভাব এতো বিস্তার লাভ করেছিলো যে ভারতের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি ধর্মজীবনকেও তা আলোড়িত করেছিলো। নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতার প্রচার বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রতি সাধারণ মানুষকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করে। এই বৌদ্ধপ্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যই পরবর্তীকালে উপনিষদভিত্তিক বেদান্তের নতুন করে ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। জনমানসে অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলেই বেদানুসারী হিন্দু দর্শনে এই মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিশেষ যত্ন লক্ষ্য করা যায়।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব) প্রচারিত মতবাদ থেকেই বৌদ্ধ দর্শন নামের সূত্রপাত। বুদ্ধ নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র যেমন, বৌদ্ধ শাস্ত্রও তেমনি এককালে একজনের দ্বারা লিখিত হয়নি। বুদ্ধের দেহত্যাগের অল্পদিন পরেই প্রবীণ শিষ্যরা তাঁর উপদেশ ও শিক্ষাবলী আবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তবর্ণী-গুহায় স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে মিলিত হন। এই সম্মেলন বৌদ্ধ সঙ্ঘ-ইতিহাসে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি নামে পরিচিত। এই সময় থেকে বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত ও মুখে মুখে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় একশ বছর পরে অনুমান খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দে মহারাজ কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। ইতোমধ্যে বুদ্ধবাণীর অংশবিশেষ সম্ভবত বিধিবদ্ধ আকারে লিখিতও হয়েছিলো। সঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম, দার্শনিক মত, আচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বহু মতভেদ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অনুমান খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে পাঞ্জাব অথবা কাশ্মীরের কোনও স্থানে চতুর্থ সম্মেলনের পর সঙ্ঘ মহাযান ও হীনযান নামে এই দুই প্রধান শাখায় পুরোপুরি বিভক্ত হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য, মহাযান ও হীনযান নাম দুটি মহাযানীদেরই উদ্ভাবন। অতএব হীনযান নামটি বিদ্বেষসূচক বলেই প্রতীত হয়। বৌদ্ধধর্মের এই শাখাটিরই নামান্তর হলো থেরবাদ বা স্থবিরবাদ। থেরবাদী শাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা এবং তৎকালীন সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে তা সংরক্ষিত হয়েছে। মহাযানী শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানে এই শাখাটির প্রভাব দেখা যায়। তবে থেরবাদীদের পালি সাহিত্যই প্রাচীনতর। তিনটি প্রধান ভাগে এই সাহিত্য সংকলিত হয়েছিলো বলেই এর নাম ত্রিপিটক। পিটক মানে ঝুড়ি। এই তিনটি পিটক হলো- বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধম্মপিটক। ত্রিপিটকের বর্তমান রূপটি ঠিক কবে বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতর রূপটির পরিচয় এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

বিনয়পিটকে বৌদ্ধসঙ্ঘ বিষয়ক নির্দেশ এবং সঙ্ঘের পালনীয় বিধি ও অনুশাসন সংকলিত হয়েছে। সূত্রপিটকে মূলত বুদ্ধের বাণী, উপদেশ এবং শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন স্থান পেয়েছে। অভিধম্মপিটক পরবর্তীকালের সংকলন। রাজা অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার তৃতীয় মহাসঙ্গীতির পর এর আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধ নিজে দর্শনচর্চা করেননি; বরং তিনি দর্শনচর্চার বিরোধীই ছিলেন। দার্শনিক সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার মূল কথা চারটি। বলা হয়ে থাকে, চারটি আর্য বা শ্রেষ্ঠ সত্যের উদ্ঘাটন করায় শাক্যমুনি গৌতম বোধিলাভ করে 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন। এই রহস্যের প্রকটিকরণই তাঁর আধ্যাত্মিক জাগরণের (বুদ্ধত্বের) সঙ্কেত দেয়। তাই বৌদ্ধধর্মের রহস্য জানার জন্য এই চার আর্য সত্যের জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। বৌদ্ধদর্শনে যাকে বলা হয় চত্বারি আর্য সত্যানি বা চার আর্যসত্য। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশের মূলে এই চারটি আর্যসত্য নিহিত রয়েছে। অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থিমোচন না-করা হলেও ক্লেশবহুল প্রপঞ্চ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তথাগত বুদ্ধের আচারমার্গিক নির্দেশনা হলো এই চারটি আর্যসত্য। এগুলো হচ্ছে-

(১) জগত দুঃখময়- সর্বং দুঃখম্ ।

(২) দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের হেতু আছে- দুঃখসমুদয়ঃ।

(৩) দুঃখের নিরোধ বা নির্বাণ সম্ভব- দুঃখনিরোধঃ। এবং

(৪) দুঃনিরোধের উপায় বা মার্গ আছে- দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ।

অর্থাৎ চার আর্যসত্য হলো- দুঃখের বিদ্যমানতা, তার কারণের বিদ্যমানতা, তার নিরোধের সম্ভাব্যতা এবং তাতে সাফল্য লাভের পথ বা উপায়। সংক্ষেপে এদেরকে বলা হয়- দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধমার্গ। এই চার আর্যসত্যকে বুদ্ধের চতুঃসূত্রীও বলা হয়।

এবং দুঃখ নিরোধের সুনির্দিষ্ট মার্গ আছে; তার নাম অষ্টাঙ্গিক-মার্গ- যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

বৌদ্ধমতে সত্তা হচ্ছে প্রতিক্ষণে জন্ম ও অবলুপ্তির এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই ধারা কার্যকারণসম্বন্ধের নিয়মের অধীন, জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। সবকিছুই ক্ষণিক। এটিই বৌদ্ধমতে ক্ষণিকবাদ বা ক্ষণভঙ্গবাদ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য। বুদ্ধ জগতের সব কিছুকে নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে বলে গণ্য করতেন। এই মতে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত সূক্ষ্ম কণাসমূহ যা নানারূপে সংযোগনিযোগের দরুণ বস্তুগত বা আত্মগত পদার্থসমূহে গঠন করে। এই ধর্ম হচ্ছে নিয়ত গতিশীল এবং অন্তহীন যোগবিয়োগের বিভিন্ন ছকমাত্র। নির্বাণপ্রাপ্তির অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তনশীল ধর্মগুলির গতি রুদ্ধ হয়। ফলে সংসারের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে, অর্থাৎ এক শরীরী সত্তা থেকে অন্য সত্তায় সংক্রমণ বন্ধ হয় এবং জগতের সাথে বস্তুপদার্থের সংযোগ আর থাকে না।

আমরা কেন দুঃখ ভোগ করি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, দুঃখের কারণ আছে। অর্থাৎ এ সত্যটি একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ এর নাম দিয়েছেন 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' (The doctrine of Dependent Origination)। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারেই দুঃখের কারণকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি। এতে বলা হয়েছে, সংসারে অকারণ কোন বস্তু নেই, প্রত্যেক বিষয়ের কারণ থাকে। প্রতিটি ঘটনাই পূর্ববর্তী কোন ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। দুঃখ একটি ঘটনা। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। কারণের অভাবে দুঃখের উৎপত্তি সম্ভব নয়। দুঃখের কারণটি জানা হলে আমরা দুঃখ নিবৃত্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

কেননা কারণটিকে দূর করতে পারলেই কার্যটি আর ঘটবে না। সংসারে জরা ও মরণ দুঃখ দু' টি প্রধান। শরীর ধারণ করার দরুন জরা-মরণের দুঃখভোগ করতে হয়, যদি শরীর ধারণ না করতে হয় তবে দুঃখ দু' টি হতে রেহাই পাওয়া যায়।

স্পষ্টই বোঝা যায়, দর্শনচর্চায় বিরূপ হলেও বুদ্ধকেও তাঁর মূল বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু কিছু দার্শনিক মত ব্যক্ত করতে হয়েছিলো। সেগুলিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ-দর্শনের প্রাচীন রূপটির ব্যাখ্যা করা হয়।

কিন্তু পরবর্তী কালের বৌদ্ধ-দর্শনের প্রকৃতি অন্যরকম। আগেই বলা হয়েছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মহাযান ও হীনযান নামে বৌদ্ধধর্মের দুটি পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু এ হলো ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা। অন্যদিকে, বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা নিয়ে বিরোধের দিক থেকে পরবর্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তার মধ্যে প্রধানত চারটি সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রধান চারটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় হলো-

(১) বৈভাষিক সম্প্রদায় : এই মতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বহির্জগতের জ্ঞান হয়। এই মতবাদকে বলা হয় বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ।

(২) সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় : এই মতেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের মানস-প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করে আমরা তার সত্তা অনুমান করতে পারি। এই মতবাদকে বলা হয় বাহ্যানুমেয়বাদ।

(৩) যোগাচার সম্প্রদায় : এই মতে বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই; একমাত্র মনই সত্য এবং তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে মনগড়া- মনের ধারণা। এই মতবাদকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ।

(৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় : এই মতে বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ কিছুরই প্রকৃত সত্তা নেই- সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য। এই মতবাদকে বলা হয় শূন্যবাদ।

বুদ্ধের মূল বাণীর সঙ্গে এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন হলেও একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং বুদ্ধের মতোই এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা একান্তভাবেই বেদ-বিরোধী বা শ্রুতিবিরোধী ছিলেন। বস্তুত, পরবর্তীকালের বৈদিক শ্রুতির অনুগামী দার্শনিকেরা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে এবং বৌদ্ধমত বিরোধিতায় যে-সব যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলির খণ্ডনই এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির একটি প্রধান প্রচেষ্টা ছিলো। অতএব প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণে এগুলিকে নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে ভাবতে বাধা নেই।

মিলন নাটুয়া
দর্শন বিভাগ